বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খণ্ড ২৯ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৮

গ্রাম বাংলায় কৃষি ও অকৃষি সম্পদের পরিবর্তন এবং গ্রামীণ জীবিকা

আবদুল বায়েস*
মাহবুব হোসেন**

"যে দিন থেকে মানবজাতি জীব-জন্তু পোষ মানানো শিখলো এবং উদ্ভিদের প্রতি যত্নবান হতে শুরু করলো, সেদিন থেকেই জমি, পানি, বন এবং পশু-চারণভূমির সাথে পুরুষ ও মহিলাদের সম্পর্ক তাদের কল্যাণের নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হতে লাগলো। আবার, এ সম্পর্ক স্থাপনে মধ্যস্থতাকারি হচ্ছে সে সমাজ, যা মানুষ সৃষ্টি করেছে এবং স্বত্তাধীন হয়েছে এবং ওই বিশেষ সমাজের বিরাজমান মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক।"

অমিয় কে, বাগচি (২০০২)

১.১। ভূমিকা

জমি বা ভূমি হচ্ছে গ্রাম বাংলায় অব্যাহত অস্তিত্বের প্রধান উৎস। বাংলাদেশের বিদ্যমান বাস্তব অবস্থাটি অত্যন্ত করুণ। জীবিকার জন্যে যুদ্ধে লিপ্ত বিশাল এক জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত তাড়া করছে অনুল্লেখ্য পরিমাণ জমির পেছনে। এর প্রধান কারণই হচ্ছে এদেশের উচ্চ জনঘনত। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ। এখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে আছে প্রায় ১০০০ মানুষ। পাকিস্তানের বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ (প্রয়াত) ড. মাহাবুবুল হক একবার জনসংখ্যার এই ঘনত্বকে বোঝাবার জন্য একটা উপমা ব্যবহার করেছিলেন। উপমাটি হলো, যদি পৃথিবীর সব মানুষকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জায়গা দেয়া যায় তবে সেই দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব ততটা হবে না, যতটা বিরাজমান বাংলাদেশে। সুতরাং, কল্পনার যেকোনো প্রসারণেই আবাদযোগ্য জমির ভিত্তি– যা কিনা জন প্রতি ০.০৬১ হেক্টর– অত্যন্ত কম। প্রতি বছর এদেশে ২০ লাখ অতিরিক্ত মানুষ যোগ দেয় প্রায় ১৫ কোটি মানুষের মহাসমুদ্রে। এইজন্য এদেশে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে জমি সবচাইতে দুর্লভ উপকরণ।

বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ভূমিহীনতার প্রকোপ ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে বাড়ছে, এবং একই সাথে, চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমছে। অন্যদিকে, বেশি জমির মালিক খানার অনুপাতও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। মোট খানার মাত্র ০.১ ভাগের কাছে ২.৫ একর কিংবা তার বেশি জমি আছে এবং মাত্র দুই ভাগের অধীনে ৭.৫ একরের বেশি জমি আছে। তবে এদেশে জমি কেন্দ্রীভূত রয়েছে কিছু পরিবারের হাতে যা ১৯৭৮ সালের ল্যান্ড ওকোপেন্সি সমীক্ষায় দেখানো হয়েছে : গ্রামীণ এলাকায় মাত্র ৯ শতাংশ পরিবারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৪৮ শতাংশ জমি (জানুজী ও পিচ ১৯৮০)।

সাম্প্রতিক কালের অতি দ্রুত অগ্রসরমান অ-কৃষিজাত কর্মকাণ্ডের কারণে ক্রমাগতভাবে কৃষি হারাচ্ছে চাষযোগ্য জমি। বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রায় ২২৫ হে. কৃষি জমি হারাচ্ছে কৃষি-বহির্ভূত

* আবদুল বায়েস, অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
** মাহবুব হোসেন, প্রধান নির্বাহী পরিচালক, ব্র্যাক।

কর্মকাণ্ডের কারণে।[১] সুতরাং একদিকে জনমিতিক চাপ এবং অন্যদিকে অ-কৃষিজাত কর্মকাণ্ডের বর্ধিষ্ণু চাহিদা ক্রমাগতভাবে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ সঙ্কুচিত করে চলেছে। তাই এটা বোধ হয় কোনো অবাক হবার মতো ঘটনা নয় যে, খানা প্রতি খামারের আয়তন ১৯৬০ সালের ১.৭০ হেক্টর থেকে ১৯৮৩-৮৪ সালে দাঁড়ায় ০.৯১ হেক্টর এবং ১৯৯৬ সালে পৌঁছে ০.৬৮ হেক্টরে (হোসেন ২০০১)। সত্তরের দশকে কিছু কিছু গ্রামীণ গবেষণা বা রুরাল স্টাডিজ কৃষি কাঠামো বাংলাদেশের কৃষিতে উন্নয়ন শক্তির অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে বলে মত দেয় (ভ্যান শ্যান্ডেল ১৯৮১, জানুজী ও পিচ ১৯৮০, বয়েস ১৯৮৭)। সাম্প্রতিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত উপপ্রমেয় বা হাইপোথেসিসটি পরীক্ষা করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধটিতে। প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য এখন রয়েছে সত্তরের দশকের এই উপপ্রমেয়টি পরীক্ষা নীরিক্ষা করার জন্য।

১.২। তথ্যের উৎস

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত অধিকাংশ তথ্য প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত। ১৯৮৭/৮৮ থেকে ২০০৩/০৪ সময়ে মোট তিনবার বাংলাদেশের ৫৭টি জেলার ৬২টি গ্রাম থেকে গ্রামীণ খানার উপর বহু স্তর বিশিষ্ট দৈব নমুনা ভিত্তিতে এবং কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ৬৪টি জেলা থেকে র‍্যানডম নাম্বার টেবিল ব্যবহার করে ৬৪টি ইউনিয়ন নির্বাচিত করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৮১ সালের আদমশুমারি প্রতিবেদন থেকে জমি, জনসংখ্যা এবং সাক্ষরতা সম্পর্কিত তথ্য ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত সকল গ্রামের জন্য সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রতি ইউনিয়ন থেকে দুটি গ্রাম নির্বাচিত করা হয় – যাদের জনসংখ্যার চাপ এবং স্বাক্ষরতার হার জাতীয় গড়পড়তার কাছাকাছি ছিল। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত গ্রামসমূহের মধ্যে সকল খানা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যার মধ্যে জমির মালিকানা ও জমি চাষাবাদের সময়কাল, আধুনিক ধানের বিভিন্ন প্রজাতির প্রয়োগ, এবং খানার প্রধানের আয়ের উৎস সম্পর্কে তথ্য নেয়া হয়েছিল। এ শুমারিতে নির্দিষ্ট গ্রামসমূহের ৯,৪৭৪টি খানা বা প্রতি গ্রামে ১৫৯টি খানার নাম সংগ্রহ করা হয়। খানার অর্থনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য পরিমাণগত তথ্যসমূহ একত্রিত করা হয় যেখানে নমুনা কাঠামো হিসেবে শুমারিকে সর্বশেষ নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জমির মালিকানার উপর ভিত্তি করে খানাসমূহকে নিম্নোক্ত চারটি দলে বিভক্ত করা হয় :

১. কার্যত ভূমিহীন (০.২ হেক্টর পর্যন্ত জমি)

২. ক্ষুদ্র খামারের মালিক (০.২ – ১.০ হেক্টর)

৩. মাঝারি খামারের মালিক (১.০ – ২.০ হেক্টর)

৪. বড় খামারের মালিক (২.০ হেক্টর এবং অধিক)

[১] এক হেক্টর সমান ২.৪৭ একর বা প্রায় ৭.৫ বিঘা জমি। যদি ধরে নেয়া যায় ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটা খানার খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ন্যূনতম ০.৪০ হে. জমি থাকা প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে জমি হারানোর ফলে প্রতি বছর ১০-১৫ লাখ লোকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে।

প্রতিটি দলকে আবার বর্গা চাষাবাদের সাথে সম্পৃক্ততার উপর ভিত্তি করে দুটি উপদলে বিভক্ত করা হয়েছে। ১৯৮৭ সালের জরিপ কাজের জন্য সঠিক মোট নমুনা খানা ছিল ১,২৩৯টি। ১৯৮৮ সালে এসে নির্দিষ্ট খানাসমূহকে একটি প্রশ্ন কাঠামোর মাধ্যমে এনে তথ্য সংকলিত করা হয় যার ভিত্তি ছিল সকল খানার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য, খানা কর্তৃক জমির সকল অংশের ব্যবহার, ১৯৮৭-৮৮ কৃষি বছরের চাষাবাদের জন্য খরচ ও আয়ের তথ্য, উপকরণে ক্রয় ও উৎপাদন বিক্রয়, জমি-বহির্ভূত অন্যান্য সম্পদের মালিকানা, কাজে নিয়োজিত লোকদের অ-কৃষি খাত হতে আয় এবং খানার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের বোধোদয়। এই জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যালোচনাসমূহ ১৯৯৪ সালে প্রকাশ করা হয় (হোসেন ও অন্যান্য ১৯৯৪)।

১৯৮৮ সালে সমীক্ষাকৃত গ্রামগুলোতে পুনরায় যাওয়া হয় ১৯৯৯-২০০০ কৃষি মৌসুমের তথ্য সংগ্রহের জন্য। এই নমুনা সংগ্রহের জন্য খানা কর্তৃক অধিকৃত সম্পদের পরিমাণ-এর মাধ্যমে শ্রেণিবিভাগ করা হয় যেখানে অংশগ্রহণমূলক গ্রাম মূল্যায়ন (পিআরএ) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। গ্রামের খানাসমূহকে ৪টি দলে বিভক্ত করা হয়: যথা- ১. ধনী, ২. স্বচ্ছল, ৩. দরিদ্র, এবং ৪. হতদরিদ্র। এই জরিপে ১৯৮৮ সালে নমুনা হিসেবে সংগৃহীত খানাসমূহের এবং তাদের শাখাপ্রশাখার অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৪টি দল হতে ৩০টি খানাকে নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করা হয়, যেখানে গুচ্ছবদ্ধ র‍্যানডম স্যাম্পলিং বা দৈব চয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে পূর্বের সকল খানা এবং তাদের শাখা-প্রশাখাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেসব খানা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে তারা এই জরিপে বাদ পড়ে। নতুন নমুনা সংগ্রহ করা হয় যেখানে পূর্বের অনুরূপ পদ্ধতি পরিলক্ষিত। ২০০০ সালে মোট নমুনার সংখ্যা ছিল ১,৮৮৮টি খানা। ২০০৪ সালে পূর্বের খানাসমূহ আবার পরিদর্শন করা হয় যার লক্ষ্য ছিল ২০০৩-২০০৪ কৃষি বছরের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা। জরিপ কাজে ২০০০ সালে অন্তর্ভুক্ত সকল খানা এবং তা ভেঙ্গে যে সকল নতুন খানা হয়েছে তাদের সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০০৩-২০০৪ সালে অল্পসংখ্যক খানা গ্রাম হতে শহরে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং তাদের স্থানে একই জমির মালিকানা সম্পন্ন খানাকে নমুনা জরিপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে মোট খানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৯২৭-তে। এই জরিপগুলোর তথ্য বেশ কিছু সারণিতে উপস্থাপিত হয়েছে এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে।

২। জমির মালিকানা এবং বর্গা ব্যবস্থা

২.১। খানার নিজ জমি

উপরোক্ত জরিপগুলোর তথ্য থেকে দেখা যায়, অবিমিশ্র বা সম্পূর্ণ ভূমিহীন (যাদের কেবলমাত্র বসত ভিটা আছে) খানার অংশ তুলনীয় বছরগুলোতে হ্রাস পেয়েছে এক-তৃতীয়াংশ থেকে প্রায় এক-চতুর্থাংশে। সুতরাং পরিসংখ্যানগতভাবে বলা যেতে পারে, সময়ের বিবর্তনে বাংলাদেশে চূড়ান্ত ভূমিহীন খানার অনুপাত বৃদ্ধি পায়নি, বরং কমেছে। অন্যদিকে, কার্যত ভূমিহীন (মালিকানাধীন জমি ০.২ হেক্টর বা ১.৫ বিঘার নিচে) খানার অংশ দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ হতে পারে, ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ ভূমিহীনদের কেউ কেউ কিছু না কিছু জমির মালিক হয়েছে। তেমনিভাবে একই সময়কালে প্রান্তিক খানাগুলোর হিস্যা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। চরম ভূমিহীনতার আংশিক প্রশমনের কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারগুলোর জন্যে নিবেদিত এনজিও কার্যক্রম এবং এর সুফল হয়তোবা এক্ষেত্রে কিছুটা অবদান রেখেছে। ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর গ্রাম থেকে শহরে

আগমন আর একটি কারণ। যাই হোক, ক্ষুদ্র খামার খানার অনুপাত মোটামুটি একই আছে যদিও তাদের নিয়ন্ত্রণে জমির হিস্যা সময়ের বিবর্তনে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

জরিপগুলোর তথ্য থেকে আরও প্রতীয়মান হয় যে, মাঝারি ও বৃহৎ চাষীদের অনুপাত ১৯৮৮ সালের তুলনায় দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে জমির মালিকানায় বিরাজমান বৈষম্যের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। যেমন, সর্বশেষ সমীক্ষার বছরের তথ্য অনুযায়ী, ৩ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিক এমন দুই-তৃতীয়াংশ খানার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মোট জমির মাত্র ১৩ ভাগ। অথচ ১৫ বিঘার উপর জমির মালিক এমন মাত্র ৫ শতাংশ খানার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে মোট জমির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (পরিশিষ্ট সারণি ১)।

তাই বড় আকারের খামারের অনুপস্থিতি এবং ভূমিহীন ও প্রায় ভূমিহীনদের সংখ্যাধিক্যের কারণে জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং সীমা উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন – এ জাতীয় ভূমি সংস্কার জমির মালিকানার বণ্টন ব্যবস্থা ও কৃষি আয়ের বণ্টনের অসমতা দূরীকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। আর সে কারণেই পুনর্বণ্টিত ভূমি সংস্কারের ইস্যুটি বাংলাদেশে প্রশ্নবিদ্ধ থেকেই যাচ্ছে।

কিন্তু, সবচাইতে বড় পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায় নিজস্ব জমির ভিত্তিতে খামারের গড়পড়তা আয়তন বিশ্লেষণে। যেখানে ভিত্তি বছরে গড়পড়তা একটা খামারের আয়তন ছিল ০.৮৭ হেক্টর, প্রায় ৪৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে ০.৫৯ হেক্টরে (সারণি ২)। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খানা বিভক্তিই খামারের আয়তন কমে যাবার মূল কারণ। ক্রমহ্রাসমান খামারের আয়তন এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, এটাকে অর্থনৈতিকভাবে উপযুক্ত বলা বেশ দুরূহ ব্যাপার। কারণ, অর্থনীতিবিদদের অভিমত, একটা ৬ সদস্যের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য ন্যূনতম এক একর জমি থাকা প্রয়োজন। যাই হোক, মোটামুটিভাবে, কৃষি খামারের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যাচ্ছে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের আগমন এবং মাঝারি ও বড় চাষীদের নির্গমন। পার্থক্যকরণ বা ডিফারেনসিয়েশন নয় বরং বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোতে নিঃস্বকরণের নিশানা বিরাজমান।

২.২। চাষকৃত জমির বিন্যাস

জমি বিতরণ ব্যবস্থার একটা অন্যতম দিক হচ্ছে চাষকৃত জমির বিতরণ। কোনো খানার চাষাবাদ করার মতো নিজস্ব জমি নাও থাকতে পারে, কিন্তু ওই একই খানা অন্যের জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করার ক্ষমতা রাখে। এবং সেই ক্ষমতা ব্যবহার করা সম্ভব বর্গাবাজারের মাধ্যমে। আবহমান বাংলায় চাষীরা যেমন নিজস্ব জমি চাষ করে আসছে, তেমনি প্রয়োজনবোধে অন্যের জমি খাজনার বিনিময়ে চাষ করে সংসারের প্রয়োজন মিটিয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, তুলনীয় পুরো সময়ে, দরিদ্র চাষীদের (নিজস্ব জমি ০.৪০ হেক্টর পর্যন্ত) অনুপাত প্রায় ৩৬ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সময়ে তাদের আওতাধীন চাষকৃত জমির পরিমাণ দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (পরিশিষ্ট সারণি ২)। তার অর্থ, নিজস্ব জমি কম থাকা সত্ত্বেও এ সমস্ত চাষী অন্যের জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। আবার যাদেরকে আমরা চিহ্নিত করে থাকি প্রান্তিক চাষী হিসেবে এবং মোট চাষীদের মধ্যে যারা ৩৩-৩৫ ভাগ, তাদের অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে চাষকৃত জমির বৃদ্ধি ঘটে বহুলাংশে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, গ্রাম বাংলায় এখন

ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষীরা চার-পঞ্চমাংশের উপর জমি চাষ করে। কৃষি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন কিংবা নীতি নির্ধারণে এ কথাটি মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে ভিত্তি বছরে মাঝারি ও বড় খামার খানার অংশ ছিল মাত্র দশ শতাংশ। তুলনীয় সময়ে তিনগুণ হ্রাস পেয়ে তাদের অংশ দাঁড়িয়েছে মাত্র তিন শতাংশে। লক্ষ করা গেছে, বিগত বছরগুলোতে মাঝারি ও বড় চাষীরা যেন কৃষিকাজ একরকম ছেড়েই দিয়েছে। ১৯৮৮ সালে এরা মোট চাষকৃত জমির ৩৬ ভাগ চাষ করতো; অথচ ইদানিং মাত্র ১৬ ভাগ জমি তাদের নিয়ন্ত্রণে চাষ হয় (সারণি ২)। এর কারণ বোধ হয় এই যে, জমি চাষ আজকাল অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ ব্যাপার তাদের জন্য যাদের নিজস্ব শ্রমশক্তি কিংবা তদারকি ক্ষমতা নেই। তাছাড়া অধিকতর মুনাফামুখী অ-কৃষিজ কর্মকাণ্ড গ্রামের মাঝারি ও বড় চাষীদের (যাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক ও মানব পুঁজি রয়েছে) ক্রমাগতভাবে আকৃষ্ট করে চলেছে। এবং সবশেষে লক্ষণীয় যে, যারা খামারে কাজ করে না এমন গ্রামীণ খানার অনুপাত সময়ের ব্যবধানে বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৩৪ শতাংশ থেকে প্রায় ৩৯ শতাংশে।

২.৩। বর্গা দেয়ার প্রকোপ

বর্তমানে ভূমিহীন একটা পরিবারও খানা জমি থেকে উৎসারিত ফসলের উপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। এর কারণ, নিজের জমি না থাকলেও অন্যের জমি ভাড়া করে বা বর্গায় নিয়ে চাষ করা যায়। বিনিময়ে অবশ্য জমির মালিককে অর্থ কিংবা ফসল হিসেবে 'খাজনা' দিতে হয়। প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ২০০৪ সালে বড় চাষীদের চার-পঞ্চমাংশই তাদের জমি আংশিক অথবা পুরো বর্গা দিয়েছিল যা ১৯৮৮ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণেরও অধিক। তার মানে, মাত্র এক-পঞ্চমাংশ বড় চাষী আজকাল নিজের জমি নিজেরাই চাষ করে থাকে (সারণি ৩)। তথ্য থেকে দেখা যায়, মাঝারি চাষীরাও যেন মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে চাষ থেকে। তাদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ নিজের জমি নিজেরা চাষ করে থাকে। ১৯৮৮-২০০৪ সময়কালে এ ধরনের খানা থেকে অন্যকে দেয়া জমির পরিমান তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই তথ্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, গ্রামীণ এলাকায় চাষের কাজে বড় এবং মাঝারি চাষীরা যেন 'হারিয়ে' যাচ্ছে। কি কি কারণে তারা মাঠ ছেড়েছে বলে মনে করা হয়, সে বিষয়ে একটু আগেই আলোকপাত করা হয়েছে।

শুধু যে বড় এবং মাঝারি চাষীরাই অন্যদের জমি দিয়ে দিচ্ছে তা কিন্তু নয়। লক্ষ করা গেছে, দরিদ্র চাষীদেরও একটা বিরাট অংশ (প্রায় অর্ধেক) নিজেদের জমি বর্গা দিচ্ছে অন্যদেরকে। অথচ ১৯৮৮ সালে দরিদ্র চাষীদের মাত্র ১৫ শতাংশ নিজের জমি অন্যকে ভাড়া দিতো। ২০০৪ সালে তাদের মোট জমির প্রায় ৪০ শতাংশ যায় অন্যদের কাছে, ১৯৮৮ সালে যে হার ছিল মাত্র ১৩ ভাগ। এ প্রবণতার অন্যতম প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে, ব্যাপকভাবে বিস্তৃত রিক্সা/ভ্যান চালনা ইত্যাদি অ-কৃষিজাত কর্মকাণ্ডে দরিদ্র চাষীদের সম্পৃক্ততা এবং এর ফলে নিজের জমি নিজে চাষ করার কাজটি অপেক্ষাকৃত অ-লাভজনক হয়ে ওঠা। তাছাড়া ক্ষুদে জমির মালিক এমন যে সব পরিবার শহরে আসছে, তারাও জমি বিক্রি না করে বর্গা ব্যবস্থায় তা চাষ করানোর প্রচেষ্টা চালায়। এবং যদি বিভিন্ন প্রকার চাষীদের কথা একত্রে বিবেচনায় আনি তাহলে দেখতে পাই যে, যারা জমি অন্যের কাছে বর্গা দিয়ে থাকে তাদের অংশ ১২ থেকে ২৯ শতাংশে উন্নীত হয়েছে এবং বর্গা দেয়া জমির হিস্যা ১২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩২ শতাংশে পৌঁছেছে। অর্থাৎ গ্রামীণ এলাকায় বর্গা বাজার ব্যাপক ও বিস্তৃত হয়ে উঠেছে।

২.৪। বর্গা নেয়ার প্রকোপ

যদি সকল খামার আয়তন একত্রে বিবেচনা করা হয় তা হলে দেখতে পাওয়া যায় যে, গত প্রায় দুই দশকে বর্গা চাষীর অনুপাত প্রায় ৪৪ শতাংশ থেকে ৫৮ শতাংশে পৌঁছেছে। এবং একই সময়ে বর্গা নেয়া জমির হিস্যা মোট চাষকৃত জমির ২৩ শতাংশ থেকে প্রায় ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে (পরিশিষ্ট সারণি ৪)। একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্গা জমি সাধারণত ভূমিহীনদের আয়ত্বে যায় এবং অন্যের জমি চাষ করে পূর্বের ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বর্তমানে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

খামারের আয়তন অনুসারে পর্যালোচনায় বিগত বছরগুলোতে বেশ কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায় (পরিশিষ্ট সারণি ৪)। প্রতীয়মান হয় যে, সকল প্রকার চাষীই জমি বর্গা নিয়ে থাকে। যখন দেখা যায়, দরিদ্র চাষীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ জমি বর্গা নেয়ার কাজে নিয়োজিত আছে তখন পূর্বেকার বক্তব্যই সত্য হয়ে উঠে। যদি ভিত্তি বছরের সাথে তুলনা করি, তবে এ অনুপাত দাঁড়ায় প্রায় দেড়গুণ বেশি। অন্যদিকে ভূমিহীন চাষীদের প্রায় অর্ধেকের বেশি জমি বর্গা নিয়ে থাকে এবং ভিত্তি বছরের তুলনায় এদের অংশের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রামীণ এলাকায় মোট চাষকৃত জমির প্রায় ৪০ শতাংশ জমি বর্গা নেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালে এ অনুপাত ছিল মাত্র ২৩ শতাংশ। দরিদ্র চাষী এবং ভূমিহীনদের বেলায় বর্গা নেয়া জমির পরিমাণ প্রায় অর্ধেক (পরিশিষ্ট সারণি ৪)। অর্থাৎ, গ্রামের দরিদ্র এবং ভূমিহীন পরিবারগুলোর মোট চাষকৃত জমির অর্ধেক আসে অন্যের কাছ থেকে "খাজনার" বিনিময়ে। যদি বর্গা বাজার ঘন বা নিবিড় না হতো, এবং এ সমস্ত দরিদ্র পরিবার যদি চাষকৃত জমি না পেতো, হয়তোবা তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়ে উঠতো আরো কঠিন– এমন কি নিবারণমূলক। এটা তাই প্রমাণ করে যে, গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র পরিবারগুলোর জীবিকা কৌশলের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে বর্গা বাজার। আমরা ধারণা করছি, এমনটি ঘটেছে সম্ভবত বড় এবং মাঝারি চাষীদের একটা বড় অংশের কৃষিকাজ থেকে সরে যাবার প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

২.৪। চাষকৃত জমি এবং বর্গাচাষী

বাংলাদেশের শস্য খাতে নিয়োজিত কৃষকদের চার ভাগে ভাগ করা যায়: (ক) মুখ্যত বর্গাচাষী – যাদের নিজেদের কোনো জমি নেই কিন্তু সবটুকু অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করা হয়; (খ) যৌথ বর্গা এবং মালিক চাষী – যারা মোট চাষকৃত জমির অর্ধেকেরও বেশি অন্যের জমি চাষ করে থাকে; (গ) যৌথ মালিক ও বর্গাচাষী – যারা অর্ধেকেরও বেশি নিজের জমি চাষ করে; এবং (ঘ) মালিক-চাষী– যারা শুধুমাত্র নিজেদের জমি চাষ করে থাকে।

দেখা গেছে যে, সময়ের বিবর্তনে গ্রাম বাংলায় মালিক-চাষীর অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে এবং এই প্রবণতা মালিক-বর্গাচাষীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য (পরিশিষ্ট সারণি ৫)। কিন্তু মুখ্যত বর্গাচাষীর অনুপাত বিগত বছরগুলোতে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্গা-মালিক চাষীর অনুপাত উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্য কথায়, মুখ্যত বর্গাচাষী খানার অনুপাত ২৮ থেকে ৪৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে তাদের আওতাধীন মোট চাষকৃত জমির পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুখ্যত বর্গাচাষীরা হচ্ছে গ্রাম বাংলার সবচাইতে দরিদ্র কৃষক পরিবার। তাদের আওতায় যে অতিরিক্ত জমি এসেছে তার উৎস মালিক-চাষী এবং মালিক-বর্গাচাষীদের ছেড়ে দেওয়া জমি। প্রতিপাদ্যটিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এ তথ্যই যথেষ্ট যে, ১৯৮৮ সালে মোট চাষকৃত জমির ৫৮ ভাগ ছিল মালিক-চাষী এবং মালিক-বর্গা চাষীদের নিয়ন্ত্রণে, কিন্তু অতি সম্প্রতি সে ভাগ দাঁড়ায় ৪৪ শতাংশে।

বর্গাবাজারে ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র জমির মালিকদের প্রাধান্য তাদেরকে খুব সীমিত জমির মালিকানা সত্ত্বেও জীবিকা অর্জন করে বেঁচে থাকার শক্তি যোগায়। এজন্য বলা যায়, বর্গা বাজার কিছুটা হলেও দারিদ্র্য নিরসনে ধ্বণাত্মক ভূমিকা রেখেছে। নীতি নির্ধারণী প্রেক্ষাপটে এর তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। যে দেশে বৈপ্লবিক ভূমি সংস্কার কর্মসূচি রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক কারণে সুদূর পরাহত বলে আপাতদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, সে দেশে বর্গাবাজার সম্পর্কিত যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সংস্কার সাধন করা যায় কিনা তা ভেবে দেখবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। সংস্কারের মূল লক্ষ্য হবে, দরিদ্র চাষী এবং জমি মালিকের জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার শর্ত যাতে উৎপাদনশীল হয় এবং দরিদ্রের পক্ষে থাকে সে দিকে লক্ষ রাখা।

৩। জমির গুণগত মান

৩.১। সেচ সুবিধাযুক্ত জমি

যদিও যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, জমি হচ্ছে গ্রাম বাংলায় জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস, কিন্তু সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন জমি-ভিত্তিক জীবিকা কৌশলে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কেননা দেখা গেছে, ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে এখন গ্রাম বাংলার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খানা, ১৯৮৮ সালে এ হার ছিল প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে সেচের আওতাধীন জমি বৃদ্ধি পেয়েছে তিনগুণ। অর্থাৎ ১৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৫ শতাংশ হয়েছে (পরিশিষ্ট সারণি ৬)। অন্যদিকে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার করে অধিকহারে চাষকৃত জমিতে সেচ দেবার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। মোটামুটিভাবে, যদি সকল সেচ মাধ্যম বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাই গ্রামীণ খানার প্রায় চার-পঞ্চমাংশের সেচ কাজে প্রবেশগম্যতা রয়েছে এবং মোট জমির প্রায় ৭২ শতাংশ এখন সেচাধীন। এমনিভাবে যান্ত্রিক সেচ কাজের আবির্ভাব গ্রামীণ বাংলার জীবিকা নির্বাহের গতি ওপ্রকৃতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তবে সবচাইতে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে, আধুনিক এই প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা কি দরিদ্র চাষীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে? সবুজ বিপ্লবের সমালোচকরা একসময় বলতেন যে, এই ধরনের ব্যয়বহুল এবং নগদ অর্থের দাবীদার প্রযুক্তি-তাড়িত কৃষিকাজ একমাত্র বড় ও মাঝারি চাষীদের পক্ষেই সম্ভব। তারা এও বলতেন, মুনাফালোভী বড় এবং মাঝারি চাষীরা সেচ দিয়ে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আরো মুনাফার আশায় দরিদ্রের কাছ থেকে বর্গা দেয়া জমি ছিনিয়ে নেবে। পরিণতিতে বর্গা চাষীরা হবে সর্বশান্ত। অন্যদিকে প্রান্তিকীকরণ হবে ক্ষুদ্র চাষীদের এই কারণে যে, আধুনিক সেচ ব্যবহার করার মতো নগদ অর্থ এবং প্রশিক্ষণ তাদের নেই। পরবর্তী অনুচ্ছেদে সত্তরের দশকের এ ধারণাগুলোকে মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরীক্ষা করার প্রয়াস নেওয়া হবে।

৩.২। সেচ সুবিধা এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী

জমির মালিকানা অনুযায়ী গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সবুজ বিপ্লবের আদি সমালোচকদের ধারণাটি অমূলক বলে প্রমাণিত হয় (পরিশিষ্ট সারণি ৭)। কেননা দেখা গেছে যে, এমনকি খুব গরিব চাষীরাও (নিজস্ব জমির পরিমাণ ০.২ হেক্টর পর্যন্ত) সেচের বাজারে তাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। যেমন, ১৯৮৮ সালে এই গোত্রের কৃষক প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জমিতে সেচ দিত। সম্প্রতি তারা প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জমিতে সেচ দেয়। অবশ্য যদি শুরুর দিকে লক্ষ করা যায় তাহলে সমালোচকদের ধারণাকে সত্য বলে ধরে নিতে হয়। কারণ ১৯৮৮ সালে এবং এমনকি চার-পাঁচ বছর আগেও সেচ কাজে বড় এবং ক্ষুদ্র চাষীদের অংশগ্রহণের ব্যবধান ছিল ব্যাপক। সেই ব্যবধান আস্তে আস্তে কমতে থাকে। অর্থাৎ, এক সময়ে আধুনিক এই প্রযুক্তিটি ব্যবহারে ক্ষুদ্র চাষীরা অনেক পিছিয়ে ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তারা এখন বড়দের প্রায় কাছাকাছি। বস্তুত প্রাথমিক পর্যায়ে যেকোনো প্রযুক্তি গ্রহণেই বড়দের আগ্রহ বেশি থাকে। কারণ ছোট চাষীদের ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা খুব কম এবং দেখে শুনে আস্তে আস্তে তারা প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহী হয়ে উঠে। তবে খেলার মাঠ যদি সমান হয়, অর্থাৎ সবার যখন প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত হয়, তখন তারা যে অধিকতর দক্ষ এবং উৎপাদনশীল হতে পারে, এটা নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ থিউডর শুল্টজ অনেক আগেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

উপরে বর্ণিত সেচজনিত তথ্যটি দেখা হয়েছে জমির মালিকানার আলোকে। যদি মোট চাষকৃত জমির বা খামারের আয়তনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়, তা হলেও উপসংহারে কোনো পরিবর্তন আসবে বলে মনে হয় না। যেমন, চাষকৃত জমির বিবেচনায়, গ্রাম বাংলার চার-পঞ্চমাংশ দরিদ্র চাষী এখন সেচের পানি ব্যবহার করছে। ১৯৮৮ সালে এই গোষ্ঠীর মাত্র ৩৬ ভাগ সেচের মাধ্যমে জমি চাষ করতো (পরিশিষ্ট সারণি ৮)। সবচাইতে বেশি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এক সময় বড় ও মাঝারি চাষীদের সেচ সুযোগে প্রবেশগম্যতা ছিল বেশি আর এখন, সময়ের বিবর্তনে, দরিদ্র খানাগুলো বড় ও মাঝারি চাষীদের পেছনে ফেলে দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আবারো অর্থনীতিবিদ শুল্টজের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে : ক্ষুদ্র চাষীরা দক্ষ। দেয় প্রযুক্তিতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি তাদেরকে অধিকতর দক্ষ করে তোলে।

৩.৩। মালিকানাধীন বিভিন্ন জমির পরিবর্তন

এই পর্যায়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার জমির মালিকানা ও তার পরিবর্তনশীলতার উপর (পরিশিষ্ট সারণি ৯)। সারণিটি হতে লক্ষ করা যায়, বসতভিটার গড়পড়তা আয়তন কমে গেছে। এই কমে যাওয়ার পেছনে সম্ভবত দুটো কারণ প্রভাবশালী। এক, খানা ভাগ হয়ে যাওয়া এবং দুই, বসতভিটার কিছু অংশে কৃষি কাজ সম্পাদন। সারণিটি হতে আরও লক্ষ করা যাচ্ছে, পুরো সময়ে চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে বার্ষিক ১.১ শতাংশ হারে। এই পর্যবেক্ষণটির সাথে কৃষি শুমারির পর্যবেক্ষণের, যা বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম দিকে আলোচিত হয়েছে, বেশ মিল রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ১ শতাংশ হারে চাষাবাদযোগ্য জমি হারিয়ে যাচ্ছে। হারিয়ে যাবার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার অ-কৃষিজ কর্মকাণ্ডে কিংবা অবকাঠামো নির্মাণে জমির চাহিদা বৃদ্ধি। পরিশিষ্ট সারণি ৯ প্রদত্ত একটি তথ্য খুব উৎসাহব্যাঞ্জক। সারণিটি হতে দেখা যাচ্ছে, বিগত বছরগুলোতে পুকুর, জলাশয় ইত্যাদিতে নিয়োজিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকাল খানা ভিত্তিক মাছের চাষ এ বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। সারণিটি হতে আরও

একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। বিগত বছরগুলোতে ফলবাগানের জন্যে জমিও বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্ভবত বর্ধিত হারে ফলমূল চাষাবাদের জন্য বাগান কিংবা বেষ্টিত ফলবাগানের জন্যে জমি বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। তা হলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সীমিত জমি সম্পদের মুখোমুখি গ্রামের খানাগুলো জমির (কৃষি জমি ব্যতিত) সর্বোচ্চ ব্যবহার সাধনে লিপ্ত আছে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণুভাবে এ সমস্ত জমি জীবিকা অর্জনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪। গবাদিপশু সম্পদ

জমি ছাড়া গবাদিপশু অন্য আর এক সম্পদ, যার উপর ভর করে গ্রামের পরিবারগুলো জীবিকা কৌশল নির্ধারণ করে। এক সময়ে গোয়াল ঘরের আকৃতি এবং পশু সংখ্যা দিয়ে গ্রামীণ পরিবারের আভিজাত্য বিবেচনা করা হতো। অর্থাৎ, ধরে নেয়া হতো যে, অধিক পশুসম্পদের মালিক খানাগুলো স্বচ্ছল খানা বা পরিবার। অন্যদিকে পশুসম্পদ বা গোয়ালঘরের অনুপস্থিতিতে দরিদ্রের দৈন্যতা প্রকাশ পেতো। কিন্তু প্রাপ্ত তথ্য একটু অন্যরকম ধারণা প্রকাশ করছে (পরিশিষ্ট সারণি ১০)। সময়ের বিবর্তনে সব প্রকার খানাই গবাদিপশু পালন থেকে সরে এসেছে। যেমন, ১৯৮৮ সালে মোট খানার ৫৩ শতাংশের অধীনে একটি হলেও গবাদিপশু ছিল, কিন্তু ২০০৪ সালে গবাদিপশুর মালিক খানার অনুপাত নেমে আসে প্রায় ৫০ শতাংশে। সবচাইতে বেশি হ্রাস পেয়েছে বড় এবং মাঝারি জোতের মালিক খানাগুলোতে। অথচ একই সময়ে গবাদিপশু আছে এমন ছোট জোতের পরিবারের অংশ ২৮ শতাংশ থেকে ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এর অর্থ, আজকাল ধনী খানাগুলো তেমন একটা গবাদিপশু পালন করে না। তবে, দরিদ্র পরিবারগুলোতে গবাদিপশু পালন জীবিকা নির্বাহের একটি উৎস। হতে পারে, এই পরিবারগুলো এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে পশু পালন শুরু করেছে। কেননা সম্প্রতিকালে এনজিওগুলো ঋণ দিয়ে পশুপালন উৎসাহিত করছে।

বড় ও মাঝারি খানাগুলোতে গবাদিপশু পালন কমে যাবার অন্যতম কারণ হতে পারে কৃষিকাজ থেকে দূরে থাকা, পশু পালনের খরচ বৃদ্ধি কিংবা এগুলো দেখাশুনা করার লোকের অভাব। আর দরিদ্র পরিবারগুলো যেহেতু বর্গার মাধ্যমে অধিক হারে জমি চাষ করছে, তাই গবাদিপশু তাদের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে দাঁড়িয়েছে। তবে, সবার বেলাতেই খানা প্রতি গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পশুর দাম যদি গুণের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, তবে বলতেই হয়, অপেক্ষাকৃত বেশি দামের গবাদিপশু আজকাল গরিবের ঘরে থাকছে।

ছাগল পালনও এক ধরনের পশুসম্পদ। আপদকালীন সময়ে ছাগল বিক্রি করে দরিদ্র পরিবার বিপদ মোকাবেলা করতে পারে। সময়ের বিবর্তনে সব ধরনের খানাতেই ছাগল পালন বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামাঞ্চলে এখন ২৩ শতাংশ খানার অধীনে ছাগল রয়েছে এবং পূর্বেকার সময়ে যা ছিল ২০ শতাংশ (পরিশিষ্ট সারণি ১০)। যদি গবাদিপশু ও ছাগল সম্পদের মোট মূল্য বিবেচনায় গ্রহণ করা হয় তা হলেও দেখতে পাওয়া যায় যে, এই দুই খাতে দরিদ্র পরিবারগুলোর সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৮৫ ডলার থেকে ১১৩ ডলারে, যা অন্য ধরনের খানার চাইতে অধিক হারে বৃদ্ধি। এক সময় গ্রাম বাংলার দরিদ্র পরিবারগুলো পশু সম্পদ সঞ্চয়নে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে গ্রামে এখন তারা এক্ষেত্রে অগ্রগামী হিসেবে বিবেচিত।

৫। অন্যান্য জমি বহির্ভূত স্থায়ী সম্পদ

জমি এবং গবাদি পশু সম্পদ ছাড়াও অন্যান্য জমি বহির্ভূত সম্পদের মাধ্যমে গ্রামের খানা জীবিকা অর্জন করে। এ সমস্ত সম্পদ তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুঁজি ভান্ডার, যার মাধ্যমে তারা বর্তমানকালে আয় উপার্জন করে থাকে। এমন কিছু সম্পদের উদাহরণ হিসেবে আসতে পারে পাওয়ার টিলার, শ্যালো পাম্প, চালের কল, ধান মাড়ানোর কল, রিকশা-ভ্যান ইত্যাদি। জমি-বহির্ভূত এ সমস্ত সম্পদ গ্রামের খানাগুলোর আয় নির্ধারণে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[২]

লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় প্রতি ১০০টি খানার মধ্যে ৮টি খানার নিজস্ব শ্যালো পাম্প আছে (পরিশিষ্ট সারণি ১১)। ১৯৮৮ সালে প্রতি ১০০ খানার প্রায় ৩টি খানায় শ্যালো পাম্প ছিল। বাংলাদেশে মোট কৃষি খামারের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লাখ ধরলে প্রায় ১২ লাখ গ্রামীণ পরিবার সেচ যন্ত্রের মালিক। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, ১৯৮৮ সালে একটা শ্যালো মেশিনের গড়পড়তা দাম ছিল ৭২৯ ডলার, যা সম্প্রতি দাঁড়িয়েছে ১৬৪ ডলারে। মনে করা হচ্ছে, আশির দশকের শেষ দিকে প্রণীত উদার আমদানি নীতি সেচ যন্ত্রের মালিকানা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আবার প্রতি ১০০ খানার মধ্যে প্রায় ৬টি খানায় হয় রিকশা নয়তো ভ্যানগাড়ী বিদ্যমান। পাওয়ার টিলার বা চালের কলের মালিক এমন খানার অনুপাত অপেক্ষাকৃত কম তবে এ সমস্ত সম্পদের মালিকানা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আর স্বাভাবিকভাবেই যে সমস্ত খানায় গরুর গাড়ি ছিল, আধুনিক বাহনের দাপটে সেই সমস্ত খানার অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। যাই হোক, প্রায় ১ শতাংশ দরিদ্র খানার নিয়ন্ত্রণে ১টি শ্যালো মেশিন রয়েছে এবং প্রায় ৯ শতাংশ খানার নিয়ন্ত্রণে একটি বা একাধিক রিক্‌শাযান রয়েছে বলে জানা যায় (পরিশিষ্ট সারণি ১২)।

৬। প্রতিষ্ঠানে প্রবেশগম্যতা ও সামাজিক সম্পদ

জমি, গবাদিপশু বা অ-কৃষি জাতীয় নির্দিষ্ট সম্পদসমূহের মতো প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশগম্যতাও একটি সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অনাদিকাল থেকে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মানুষের জীবিকা প্রভাবিত করে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান, তার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করা তাই অত্যন্ত জরুরি। উদাহরণস্বরূপ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে একজন ব্যবসায়ী চলতি বা স্থির পুঁজির অভাব দূর করতে পারে; রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রবেশগম্যতার মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধা আদায় করা যেতে পারে। এ ধরনের প্রবেশগম্যতাকে এখানে পুঁজি হিসেবে ধরা হবে, যেহেতু এগুলো উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে থাকে।

২০০৪ সালের জরিপে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, গ্রাম বাংলায় প্রায় ২৯ শতাংশের মতো খানা এনজিওর সদস্য, যা ২০০০ সালে ছিল প্রায় ২৪ শতাংশ (পরিশিষ্ট সারণি ১৩)। সবচাইতে দরিদ্র (নিজস্ব জমি ০.৪ হেক্টর পর্যন্ত) খানাগুলোর এনজিও প্রতিষ্ঠানে প্রবেশগম্যতা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ, বর্তমানে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দরিদ্র খানার এনজিওতে প্রবেশগম্যতা রয়েছে, যা ১৯৮৮ সালে ছিল মাত্র এক-তৃতীয়াংশের একটু উপরে। তার অর্থ, গ্রামের সবচাইতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এনজিওতে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে এবং এ প্রবেশগম্যতা হয়তোবা অন্যান্য সম্পদ, যেমন

[২] লেখকদ্বয় অবশ্য স্বীকার করে নিচ্ছে যে, জমির মালিকানা এ ধরনের সম্পদে প্রবেশগম্যতা বা সম্পদ সঞ্চয়নে নির্ধারক হতে পারে।

রিকশা, ভ্যান, গবাদিপশু কিংবা পাম্প ইত্যাদি সঞ্চয়নে ভূমিকা রেখেছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রবেশগম্যতা তাই অন্যান্য সম্পদ সৃষ্টিতে অবদান রেখে দরিদ্রের জীবিকা নির্বাহ কৌশলকে প্রভাবিত করে।

তবে, কিছুটা অস্বাভাবিকভাবে এনজিওর সুযোগ পেয়েছে এমন খানাগুলোর প্রায় এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল শ্রেণি (জমি ১ হেক্টর-এর উপর) থেকে আসা, যাদের জন্য এনজিও কার্যক্রম ব্যবহৃত হবার কথা নয় (পরিশিষ্ট সারণি ১৩)। ভিত্তি বছরে অবশ্য ধনীরাও এ সুযোগ নিয়েছে (প্রায় এক-পঞ্চমাংশ) এবং এটা বোধ হয় প্রমাণিত যে বছর পরিক্রমায় স্বচ্ছল পরিবারগুলো এনজিওর কার্যক্রমে অধিকতর সম্পৃক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ, কাগজে-কলমে ভূমিহীন বা কার্যকর ভূমিহীনদের কথা বলা হলেও বাস্তবে 'ভূ-স্বামীদের' কাছেও ক্রমান্বয়ে এনজিওর সেবা সম্প্রসারিত হচ্ছে। নীতিগত পর্যালোচনায় এধরনের পর্যবেক্ষণ গ্রামীণ সমাজে সম্পদে সমতা সূচক প্রবেশগম্যতার প্রশ্নটি জাগিয়ে তোলে।

এবার আসা যাক রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়টি (পরিশিষ্ট সারণি ১৩)। গ্রাম বাংলার মোট খানার মাত্র দুই থেকে তিন শতাংশের কোনো না কোনো সদস্য রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে জড়িত। এখানেও গড়পড়তা হিসাবটি খণ্ডিত অবস্থানকে ঢেকে রাখছে। অর্থাৎ, লক্ষ করা যাচ্ছে যে স্বচ্ছল পরিবারগুলোর প্রায় ২৬ থেকে ৩০ শতাংশ কোনো না কোনোভাবে রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। এর বিপরীতে ১০০টি ছোট জোতের মালিক খানার মধ্যে মাত্র ৫ থেকে ৭টি খানা রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। যদি ধরে নেই যে, রাজনৈতিক যোগাযোগ বা রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা সম্পদ সৃষ্টিতে কোনো ভূমিকা রাখে তাহলে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ বলে দেয় যে, এক্ষেত্রে গ্রামের স্বচ্ছল শ্রেণি অনেক এগিয়ে এবং গরিবরা অনেক পিছিয়ে। এ ধরনের বৈষম্য স্বাভাবিকভাবেই জীবন-জীবিকা কৌশলের অন্যান্য শাখা-প্রশাখায়ও বৈষম্য সৃষ্টি করছে বলে প্রতীয়মান হয়।

আবার এটাও মনে রাখতে হবে যে, শুধুমাত্র এনজিওর সদস্য হওয়ার মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঋণের ব্যবহার অত্যন্ত চমকপ্রদ উন্নতি ঘটেছে দরিদ্র খানার বেলায়। বর্তমানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খানা প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করছে, যা ১৯৮৮ সালের তুলনায় প্রায় তিনগুণ (পরিশিষ্ট সারণি ১৪)। এটা সহজেই অনুমেয় যে, খানা কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক উৎস (মূলত এনজিও) হতে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্বে যেখানে মহাজনদের দৌরাত্ম কৃষককে সর্বশান্ত করে ফেলতো। বর্তমানে এনজিও প্রদত্ত ঋণের সহজলভ্যতা তাদেরকে অন্যান্য সম্পদে প্রবেশগম্যতা সহজ করে তুলেছে। বৃহৎ জমির মালিকেরা এই প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বাজারের সুবিধা তেমন গ্রহণ করেনি। তবে আলোচ্য সময়কালে মাঝারি জমির মালিকদের কর্তৃক ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যার বেশ কিছু অংশ এই প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বাজারে প্রবেশগম্যতার ফল ।

অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী চিত্র পাই (পরিশিষ্ট সারণি ১৪)। বর্তমান সময়ে গ্রামীণ খানাসমূহের মাত্র এক-দশমাংশ অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে গ্রহণ করে থাকে, পূর্বেকার সময়ে যা ছিল প্রায় এক-তৃতীয়াংশের মতো। অর্থাৎ, বর্তমান সময়ে অপেক্ষাকৃত কম সুদে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, পূর্বে যা মহাজনদের নিকট হতে উচ্চ সুদে সংগ্রহ

করা হতো। এর ফলে সকল গোষ্ঠীর জন্যই একটা ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়, বিশেষত গরিবদের ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গরিব ঋণগ্রস্তদের মধ্যে আজকাল মাত্র এক-পঞ্চমাংশ অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ, যেমন, মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হতে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পূর্বে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি খানা এসকল উৎসের উপর নির্ভরশীল ছিল।

৭। সম্পদের স্বত্বাধিকারে পরিবর্তন

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে যে প্রশ্নটি মনে উঁকি দিতে পারে তাহলো : গ্রামীণ জনগণ কি আলোচ্য সময়ে সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে? এবং সত্যই যদি তা সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে কি ধরনের সম্পদের সৃষ্টি তাঁরা করেছে? এবং এসকল সম্পদ কাদের নিকটইবা গুরুত্বপূর্ণ? এই প্রশ্নগুলোর বিষয়ে আলোকপাত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণির ভূমি মালিক কর্তৃক সম্পদ সৃষ্টির তথ্য এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে (পরিশিষ্ট সারণি ১৫)।

পরিশিষ্ট সারণি ১৫ হতে দেখা যায় যে, সময়ের বিবর্তনে সকল খানার জন্যই ভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, মাঝারি ও বৃহৎ জমিসমূহ আরও শ্রেণিকরণ ও বিভাজিত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আলোচ্য সময়ে প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যান্য উপাদানসমূহের– যেমন, সেচ জমি, বর্গা জমি, চাষকৃত জমি ইত্যাদির মালিকানা বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ, বিগত বছরগুলোতে খানার আওতাধীন মালিকানায় জমির পরিমাণ হ্রাস পেলেও সেচ সম্প্রসারণের মাধ্যমে জমির গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যালয়ে অবস্থান এবং পড়াশোনা (গড় শিক্ষা), খানার আকৃতি হ্রাস, এবং অ-কৃষিজাত শ্রমিকের লভ্যতা খানাগুলোর মানবসম্পদ বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। পরিশিষ্ট সারণি ১৫ হতে আরও দেখা যায়, সময়ের বিবর্তনে ভৌত পুঁজি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থিক পুঁজি সৃষ্টির জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে। যেমন, ১৯৮৮ সালে একটা ভূমিহীন খানার কৃষি ও অ-কৃষি খাতের পুঁজির পরিমাণ ছিল ১৬১ ডলার, যা অতি সম্প্রতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৬ ডলারে। অর্থাৎ, গ্রামের সবচাইতে দরিদ্র শ্রেণিও পুঁজি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

কার্যত ভূমিহীন খানাসমূহও প্রান্তিকভাবে সম্পদ বৃদ্ধি করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে হয়তো নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে, নয়তো বর্গাবাজারে প্রবেশের ফলে। মানব পুঁজির ক্ষেত্রেও এই খানাগুলো ব্যাপকভাবে উন্নতি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, অতীতে যেখানে তাদের গড়পড়তা স্কুল জীবন ছিল ১.৭৪ বছর, বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ৩.১৯ বছরে। অন্যদিকে খানার আকৃতি হ্রাস পেয়েছে এবং অ-কৃষি কর্মকাণ্ড জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি সম্পদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আলোচ্য সময়ে এসকল খানাসমূহ তাদের ভৌত পুঁজি ৫৩ শতাংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। পুঁজির সঞ্চয়ন কৃষির জন্য ১০৬ শতাংশ, যা অ-কৃষির জন্য ২৯ শতাংশ। সর্বশেষ, কার্যত ভূমিহীন খানাসমূহ আলোচ্য সময়ে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ দ্বিগুণ করতে সক্ষম হয়েছে। কার্যত ভূমিহীন খানাগুলো জীবিকার প্রয়োজনে অন্যান্য সম্পদের সঞ্চয়নে সক্ষম হয়েছে।

এখানে একটা বিষয় না উল্লেখ করলেই নয়। মানব পুঁজি সৃষ্টির ক্ষেত্রে জমির মালিকানা যে একটা শক্তিশালী নিয়ামক তার প্রমাণ, মাঝারি ও বড় চাষীদের স্কুল পঠনের গড়পড়তা সময় ৫.৫৯ বছর থেকে ৭.৭৩-এ উন্নীত হয়েছে। মানব সম্পদের দিক থেকে অন্যান্যদের তুলনায় উচ্চতর অবস্থান তাদেরকে নিঃসন্দেহে অন্যান্য পুঁজি সঞ্চয়নে উৎসাহ যুগিয়েছে। সম্ভবত শিক্ষা বৈষম্যই গ্রামীণ সমাজে

আয় বৈষম্যের অন্যতম কারণ। যদি ভৌত পুঁজির কথা বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়, তাহলে বৈষম্যের বিকট চেহারাটা অতি পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। যেমন, ১৯৮৮ সালে কার্যত ভূমিহীন খানার ভৌত পুঁজির পরিমাণ ছিল ১৬১ ডলার যা মাঝারি ও বড় খানার মাত্র এক-চতুর্থাংশ। আবার, ২০০৪ সালে এ পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪৬ ডলার কিন্তু বড় চাষীদের পুঁজি তাঁদের তুলনায় ৪ গুণ বেশি। তেমনটি লক্ষ্য করা যায় ঋণের ক্ষেত্রেও। একদিকে নিজস্ব মালিকানায় বেশি জমি, অন্যদিকে ভৌত ও আর্থিক পুঁজিতে আপেক্ষিক প্রাধান্য গ্রামাঞ্চলে ধনী-দরিদ্র ব্যবধানকে আরেও বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৮। উপসংহার

উপসংহারে বলা যায়, গত দুই দশকে গ্রাম বাংলায় কৃষি ও অকৃষি সম্পদের প্রভুত ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ভূমিহীন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক এবং গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রতিষ্ঠানে এবং সম্পদে অভিগম্যতা সহজ হওয়ার ফলে। মূলত এনজিও প্রদত্ত ঋণের সম্প্রসারণের জন্য ঋণ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে ভূমিহীন খানা সবচাইতে সুবিধাজনক অবস্থানে এসেছে এবং একই সাথে তারা জীবিকার প্রয়োজনে সম্পদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নীতিমালা সংক্রান্ত উপসংহার একটাই, তা হলো প্রাতিষ্ঠানিক উৎসে এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধায় দরিদ্রের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধিকল্পে এনজিও এবং সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে এবং এ কাজটি শুধুমাত্র রাষ্ট্রের অভিভাবকত্বে এবং সহায়তায় সম্পাদন করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধের আলোচনা হতে আরও একটি যে সত্য প্রকাশ পেয়েছে তা হলো, শিক্ষা বৈষম্য গ্রামাঞ্চলে ধনী-দরিদ্র ব্যবধানের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। এ ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হলে শিক্ষায় দরিদ্রদের সহজ প্রবেশগম্যতা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য এনজিও এবং সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

এই প্রবন্ধের আলোচনার উপর বিত্তি করে আর একটি যে নীতি সংক্রান্ত সুপারিশ পেশ করা যেতে পারে তা হলো, যেহেতু গ্রামবাংলায় পচনশীল দ্রব্য উৎপাদনে ভূমির ব্যবহার বাড়ছে, সেহেতু এ সমস্ত দ্রব্য বাজারজাতকরণে অবকাঠামো, সংরক্ষণাগার ও তথ্যগত সুবিধা সরবরাহ করার জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। তাছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ থেকে অথবা এনজিওর মাধ্যমে এ সব কর্মকাণ্ডে লিপ্ত খানাগুলোর সদস্যদের বিশেষত মহিলা সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করার জন্যও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

BBS (1999): *Census of Agriculture - 1996. National Series, Volume 1*, Dhaka, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning.

Boyce, J. K. (1987): *Agrarian Impasse in Bengal: Institutional Constraints to Technological Change*? Oxford University Press.

Hossain M., M.L. Bose, A. Chowdhury and R. Meinzen-Dick (2002): "Changes in Agrarian Relations and Livelihoods in Rural Bangladesh: Insights from Repeat Village Studies," In : V.K. Ramachandran and M. Swaminathan (eds). *Agrarian Studies: Essays on Agrarian Relations in Less Developed Countries*, New Delhi, Tulika Books.

Hossain, M. (2001): "Recent Development and Structural Changes in Bangladesh Agriculture: Issues for Reviewing Strategies and Policies," In Centre for Policy Dialogue (ed.), *A Review of Bangladesh's Development 2000*, Dhaka: University Press Ltd.

Jannuzi, F.T. and J.T. Peach (1980): *Agrarian Structure in Bangladesh: An Impediment to Development*, Boulder, Colorado: Westview Press.

Van Schundel, W. (1981): *Peasant Mobility: The Odds of Peasant Life in Bangladesh*, Asser, The Netherlands, Van Gorcum.

পরিশিষ্ট

সারণি ১

জমির মালিকানা এবং খানার বিন্যাস

নিজস্ব জমি (হে:)	খানার অনুপাত (%)			নিজস্ব মোট জমির অংশ (%)		
	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪
শুধু বসতভিটা	৩৫.১	৩৪.৪	২৫.৭	১.৬	১.৬	১.১
০.২০ হে: পর্যন্ত	১২.৩	১৫.৮	২৭.৮	২.৪	৩.২	৫.৫
০.২১-০.৪০	১১.৬	১৫.১	১২.৮	৫.৫	৮.২	৭.৮
০.৪১-১.০	২১.৭	১৯.৩	২০.২	২২.৭	২৩.২	২৭.২
১.০-২.০	১১.২	১০.২	৮.৯	২৫.৮	২৬.৮	২৫.২
২.০-৩.০	৫.৩	২.৪	২.৭	২০.৮	১০.৮	১৩.১
৩.০১ হে: এবং উপরে	২.৯	২.৯	২.০	২১.২	২৬.৩	২০.১
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
নিজস্ব জমির গড় আয়তন (হে:)	-	-	-	০.৬১	০.৫৩	০.৪৮

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ২

চাষকৃত জমি বিতরণে পরিবর্তন

চাষকৃত জমি (হে:)	খামারের অনুপাত (%)			মোট চাষকৃত জমির অংশ (%)		
	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪
০.২০ হে: পর্যন্ত	২০.৭	২২.২	২৫.৩	২.৬	৪.০	৫.৩
০.২১-০.৪০	১৪.৯	২৪.৫	২৫.২	৪.৯	১০.৯	১২.৩
০.৪১-১.০	৩৫.০	৩৪.৩	৩৩.৬	২৬.৬	৩২.৭	৩৬.০
১.০-২.০	১৮.৮	১৫.১	১২.৯	৩০.০	৩১.৮	৩০.১
২.০-৩.০	৭.৪	২.১	২.৩	১৯.৮	৭.৩	৯.১
৩.০১ হে: এবং উপরে	৩.৩	১.৯	০.৮	১৬.০	১৩.২	৭.৩
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০
অ-কৃষি খানা	৩৩.৯	৪২.৩	৩৮.৫			
চাষকৃত জমির গড় আয়তন	-	-	-	০.৮৭	০.৬৫	০.৫৯

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ৩

চাষকৃত জমি এবং বর্গা দেয়ার প্রকোপ

চাষকৃত জমি (হে:)	বর্গাদার খানার অনুপাত (%)			নিজস্ব জমির কতটুকু বর্গায় (%)		
	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪
০.২০ হে: পর্যন্ত	৩.৮	৭.২	৮.৪	৬.১	১২.৮	১৫.০
০.২১-০.৪০	১১.১	৩৫.৩	৪০.৭	৭.৩	২১.১	২২.৮
০.৪১-১.০	১৭.৯	৪৫.৯	৫২.৬	৯.৯	২৬.৭	২৮.৩
১.০-২.০	২১.৬	৬০.৯	৬১.৪	১১.১	৩১.১	৩০.৭
২.০-৩.০	২৯.২	৭৫.৬	৭০.৬	১৩.২	৩৮.২	৩৪.৬
৩.০১ হে: এবং উপরে	৪৪.৪	৭৯.৬	৮৯.৫	১৭.২	৩৩.৬	৪৫.০
মোট	১২.৭	২৮.১	২৯.৪	১২.১	২৯.৮	৩১.৭

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ৪

চাষকৃত জমি এবং বর্গা নেয়ার প্রকোপ

চাষকৃত জমি (হে:)	বর্গাচাষী খানার অনুপাত (%)			বর্গা নেয়া জমির (অংশ) (%)		
	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪
০.২০ হে: পর্যন্ত	৩৪.২	৪৫.৪	৫৩.৭	৩১.১	৪৩.৮	৫০.৩
০.২১-০.৪০	৪১.৮	৫৭.৪	৬৫.৪	২৭.১	৪৩.৮	৫২.৯
০.৪১-১.০	৫০.০	৫৯.৮	৫৭.০	৩১.০	৪০.২	৩৯.০
১.০-২.০	৫০.০	৫২.৪	৬০.৮	২৮.৪	৩০.১	৩৯.৮
২.০-৩.০	৩৫.০	৪৭.৮	৪০.৭	১৩.১	২৬.৮	৩৪.৭
৩.০১ হে: এবং উপরে	২৫.৯	৪০.০	৪৪.৪	১১.৮	১২.৫	২০.১
মোট	৪৩.৬	৫৪.২	৫৮.৩	২৩.৪	৩২.৯	৩৯.৮

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ৫

বিভিন্ন জমি ব্যবস্থাপনা ও চাষকৃত জমি

জমি চাষ ব্যবস্থা	খামারের অনুপাত (%)			মোট চাষকৃত জমির অংশ (%)		
	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪
শুধু বর্গাচাষী	১৩.৬	২০.৫	২৭.৬	৬.৭	১২.৪	১৯.৩
বর্গাচাষী-মালিক	১৪.৪	১৯.০	১৮.০	১৫.৩	২০.০	২১.১
মালিক-বর্গাচাষী	১৫.৭	১৪.৮	১২.৭	১৯.৮	২১.০	১৬.১
মালিক-চাষী	৫৬.৩	৪৫.৭	৪১.৭	৫৮.২	৪৬.৬	৪৩.৫
মোট	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০	১০০.০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ৬

সেচের বিস্তার এবং সেচের মাধ্যম

সমীক্ষার বছর	ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থা করে সেচ		ভূ-পৃষ্ঠভাগ পানি ব্যবহার করে সেচ		সব ধরনের সেচ	
	কত ভাগ খানা সেচ দেয় (%)	সেচকৃত জমি (%)	কত ভাগ খানা সেচ দেয় (%)	সেচকৃত জমি (%)	কতভাগ খানা সেচ দেয় (%)	সেচকৃত জমি (%)
১৯৮৭/৮৮	৩২.৬	১৯.০	১০.৯	৫.১	৪২.২	২৪.০
১৯৯৯/০০	৫৭.২	৪৮.৯	১৭.১	১৪.৮	৭২.২	৬৩.৬
২০০৩/০৪	৬০.৮	৫৫.২	২১.১	১৭.০	৭৮.৮	৭২.২

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ৭

সেচের বিস্তার এবং সেচের মাধ্যম

নিজস্ব জমি (হে:)	প্রবেশগম্যতা হার (%)			সেচকৃত জমি (মোট চাষকৃত জমির %)		
	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪
০.২০ হে:পর্যন্ত	৩১.৮	৬২.৬	৭৪.০	২৯.৪	৬১.১	৭৩.৯
০.২১-০.৪০	৩৫.৩	৭২.৭	৭৯.৮	২৬.৩	৬৪.৯	৭৭.৪
০.৪১-১.০	৪৩.৬	৭৪.৯	৭৭.৩	২৪.৯	৬১.১	৭০.২
১.০-২.০	৪৮.৯	৭২.৮	৮৫.১	২২.৫	৬১.২	৭৪.৬
২.০ হে: এবং উপরে	৫২.৫	৭৯.৪	৮৩.১	২৪.০	৬৬.৯	৭০.৭
মোট	৪২.৩	৭২.২	৭৮.৮	২৪.০	৬৩.৬	৭২.২

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ৮

চাষকৃত জমি ও সেচে প্রবেশগম্যতা

চাষকৃত জমির আয়তন (হেক্টর)	প্রবেশগম্যতা হার (%)			সেচকৃত জমি (মোট চাষকৃত জমির %)		
	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪
০.২০ হে: পর্যন্ত	৩৫.৫	৭৩.৮	৮৫.০	৩৫.২	৭৩.৮	৮২.৪
০.২১-০.৪০	৪৭.৫	৮৩.৪	৮৩.৯	৩০.৩	৭৫.২	৭৯.৩
০.৪১-১.০:	৪৫.৫	৭৫.৭	৮১.৪	২৪.৭	৬২.৬	৭৪.৪
১.০-২.০	৪৮.১	৭৮.১	৮১.৭	২২.৬	৬০.৯	৭০.৯
২.০ হে: এবং উপরে	৫০.৫	৭২.১	৮০.৬	২১.৮	৫৪.৮	৭২.৮
মোট	৪৪.৭	৭৭.৪	৮৩.০	২৩.৬	৬২.৩	৭৪.১

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ৯

বিভিন্ন প্রকার জমির স্বত্তাধিকার ও পরিবর্তন

জমির ধরন	মালিক খানার হার (%)		মোট জমির অংশ (%)		জমির গড়পড়তা আয়তন (একর)	
	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪
বসতভিটা	৮৯.২	৯৬.৪	১০.৪	৭.৫	০.১৮	০.০৯
বাগান/অরচার্ড	১২.৭	৪২.৩	২.৯	৭.৫	০.১৫	০.২১
পুকুর/জলাশয়	১১.৪	৩৭.৬	১.৫	৩.৯	০.২০	০.১২
চাষযোগ্য জমি	৬২.২	৫৮.০	৮৪.৪	৭৭.৪	২.০৪	১.৫৮

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ১০

গবাদিপশুর মালিকানা (নিজস্ব জমি অনুযায়ী)

বিবরণ	০.২ হে: পর্যন্ত		০.২১-১.০ হে:		১.০ হে:এবং উপরে		সব খানা	
	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪
গবাদিপশু								
মালিক খানার অংশ (%)	২৮.৩	৩৮.২	৬৬.৮	৫৮.৭	৯১.৩	৭১.৯	৫৩.৩	৪৯.৬
খানা প্রতি গবাদি পশু (সংখ্যা)	১.৭২	২.২২	২.২৩	২.৬৪	৩.৩০	৩.৮৩	২.৪৬	২.৭০
গড়পড়তা দাম (ডলার)	৭২.২০	৯৯.৮৪	৮৩.৭৩	৯৩.২৫	৮৮.৮১	৯১.২৬	৮৩.৯৬	৯৪.৯৩
ছাগল								
মালিক খানার অংশ (%)	১৭.২	২১.২	১৯.৭	২৪.১	২৫.০	২৮.৯	১৯.৬	২৩.২
খানা প্রতি গবাদি পশু (সংখ্যা)	১.৬৭	২.৩৬	১.৭৮	২.৫১	২.০৩	৩.৪৮	১.৮০	২.৬০
গড়পড়তা দাম (ডলার)	১২.৩৫	১৩.৫৮	১২.৭৬	১৪.৫৮	১৯.২৪	১৫.৬৭	১৪.৪২	১৪.৩৮

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ১১

অন্যান্য জমি-বহির্ভুত সম্পদ

স্থায়ী সম্পদ	মালিক খানার অনুপাত (%)		সম্পদের গড়পতা দাম (ডলার)	
	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪
শ্যালো পাম্প/টিউবওয়েল	২.৮৩	৮.২৮	৭২৯	১৬৪
পাওয়ার টিলার	-	১.০৬	-	৩৭১
রাইস মিলার	০.৪০	১.০১	২৪৯	৩৮৪
থ্রেশিং মেশিন	-	২.৫০	-	২১
গরুর গাড়ি	৪.২৮	১.৪৯	৮৮	৩৭
রিক্সা/ভ্যান	০.১৬	৫.৬৮	৩৮	৪০
মোটর সাইকেল	-	১.২২	-	৯৫৬

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ১২

জমির মালিকানা ভিত্তিক শ্যালো পাম্প এবং রিক্সা-ভ্যানের মালিকানা, ২০০৩/০৪

জমির মালিকানা	শ্যালো টিউবওয়েল এবং পাম্প		রিক্সা-ভ্যান	
	খানার অনুপাত (%)	গড় দাম (ডলার)	খানার অনুপাত (%)	গড় দাম (ডলার)
০.২০ হে. পর্যন্ত	০.৮৪	৭৮.৬১	৯.২৮	৪১.৮৩
০.২১-১.০ হে.	৭.৪০	১৫৭.৩৯	২.৪৭	৩৩.৪৫
১.০১ এবং তদূর্ধ্ব	৩৪.১	১৪৫.৫৫	১.০৩	৩৫.৭০
সকল খানা	৮.১	১৪৬.১৫	৫.৭	৩৯.৭৭

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ১৩

জমির মালিকানা ও বিভিন্ন সংস্থায় প্রবেশগম্যতা (মোট খানার %)

জমির মালিকানা (হে.)	এনজিও		রাজনৈতিক দল	
	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪
শুধুমাত্র বসতভিটা	৩০.৬	৩৬.৭	০.৩	-
০.২০ হে: পর্যন্ত	২৬.৯	৩৫.৩	০.৭	১.১
০.২১-০.৪০	২৩.৬	২৩.৬	২.৮	১.৬
০.৪১-১.০	১৭.৮	২১.৯	৪.৪	২.৬
১.০১-২.০	১৪.৬	১৬.৪	৪.২	৫.৩
২.০১-৩.০	৪.৪	১১.৮	১৭.৮	৯.৮
৩.০১ হে. এবং তদূর্ধ্ব	৩.৭	২.৬	১৩.০	১৫.৮
সকল	২৩.৫	২৮.৫	২.৭	২.১

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ১৪

জমির মালিকানা ও ঋণে প্রবেশগম্যতা

চাষকৃত জমি (হে:)	প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহীতা খানার অনুপাত (%)			অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহীতা খানার অনুপাত (%)		
	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	১৯৯৯/০০	২০০৩/০৪
শুধুমাত্র বসতভিটা	১৬.৭	৩০.৭	৩২.৯	৩১.০	১৪.৯	১১.৯
০.২ হে: পর্যন্ত	৪.৮	২৭.৬	৩৫.৭	৩৩.৬	১৩.২	১০.৩
০.২১-০.৪০	১০.৪	২২.৯	২৬.০	২৭.১	১২.৩	৮.৯
০.৪১-১.০	৩০.৫	২৩.০	২৭.৪	৩০.৬	৬.৩	৮.৭
১.০-২.০	১৩.১	২৩.৪	২৪.৬	১৯.৪	৯.৪	৬.৪
২.০১ - ৩.০	৫.৮	২০.০	৩৩.৩	২১.৫	১১.১	১৩.৭
৩.০১ এবং তদুর্ধ	১৮.৮	২৪.১	১৮.৪	১৬.৭	১৬.৭	১০.৫
সকল	১১.৯	২৬.৪	৩০.৭	২৮.৬	১২.০	১০.০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।

সারণি ১৫

জমির মালিকানা ও সম্পদ সত্ত্বাধিকারে পরিবর্তন, ১৯৮৭/৮৮ এবং ২০০৩/০৪

উপাদান	ভূমিহীন খানা		মধ্যম এবং বড় জমি মালিকানা		সকল খানা	
	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪	১৯৮৭/৮৮	২০০৩/০৪
প্রাকৃতিক মুলধন (হে:):						
খানার নিজস্ব জমি	০.০৫	০.০৬	২.১৩	২.০৭	০.৬১	০.৪৮
সেচ জমি	০.০১	০.০২	০.৪৪	১.২৩	০.১২	০.২৭
চাষকৃত জমি	০.১২	০.১৭	১.৭১	১.০১	০.৫৭	০.৩৬
বর্গা জমি	০.১০	০.১৬	২.১১	০.০৭	০.১৩	০.১৪
মানব পুঁজি (সংখ্যা):						
খানার আকৃতি	৫.০৯	৪.৯৪	৮.০২	৬.৩৯	৫.৯১	৫.২৯
কৃষি শ্রমিক	১.০২	০.৮৪	১.৮৭	১.৩৮	১.৩১	১.০০
অ-কৃষি শ্রমিক	০.৮৫	১.০২	০.৬৫	০.৯১	০.৭৩	০.৯১
মোট শ্রমিক	১.৮৭	১.৮৫	২.৫৩	২.২৯	২.০৩	১.৯৮
গড় শিক্ষা	১.৭৪	৩.১৯	৫.৫৯	৭.৭৩	৩.১৪	৪.৬০
ভৌত পুঁজি (ডলার):						
কৃষি পুঁজি	৫০	১০৩	৩৭০	৩৮৩	১৫২	১৬৭
অ-কৃষি পুঁজি	১১১	১৪৩	৩৮৪	৭৬২	১৬৯	২৬৮
মোট পুঁজি	১৬১	২৪৬	৭৫৫	১১৪৫	৩২১	৪৩৫
আর্থিক পুঁজি (ডলার) :						
প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ	৭	৪৫	৩০	১১৬	৩০	৫৮
অ-প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ	২৬	২৯	৮০	৫৪	৮০	৩২
মোট ঋণ	৩৩	৭৪	১১০	১৭০	১১১	৯০

উৎস: মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত বিভিন্ন বছরের উপাত্ত।